ধর্ম্মে সার্ব্বজনীনতা

শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বহু ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ভারতবর্ষে উদ্ভূত হইয়াছে এবং প্রসার লাভ করিয়াছে। আবার খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায় ভারতের বাহিরে উদ্ভূত হইলেও ভারতবর্ষেও তাহাদের বিস্তৃতি কম নহে। ইহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকগণই বলিয়া থাকেন—তাঁহাদের ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন ; কেহ কেহ একথাও বলেন যে, তাঁহাদের ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম্মই সার্ব্বজনীন নহে। কিন্তু এই সার্ব্বজনীনতার ব্যাপকতা কতটুকু, তৎসম্বন্ধেই আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ইতঃপূর্ব্বে আমরা ধর্ম্ম-শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি—ধর্ম্মকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—আত্মধর্ম্ম ও অনাত্মধর্ম্ম। ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মা ও জীবাত্মার নিত্যসম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত—স্থূলতঃ সেই নিত্য সম্বন্ধাত্মকই—যে ধর্ম্ম, তাহা আত্মধর্ম্ম, ইহা নিত্য। আর অনাত্ম দেহাদির উপর প্রতিষ্ঠিত যে ধর্ম্ম, তাহা অনাত্মধর্ম্ম ; দেশ-কাল-পাত্রানুসারে ইহা পরিবর্ত্তনশীল ; লোকধর্ম্ম, দেহ-ধর্ম্ম, সমাজ-বিধি প্রভৃতি অনাত্মধর্ম্ম। অনাত্ম ও পরিবর্ত্তনশীল দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া নিত্য আত্মধর্ম্মের সাধনাঙ্গগুলিও যুগে যুগে বিভিন্ন হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে অনেক আচারও ধর্ম্মনামে অভিহিত হইয়া থাকে ; সম্ভবতঃ আচারের অবশ্য-পালনীয়তা জনসাধারণের চিত্তে দৃঢ়বদ্ধ করিবার নিমিত্তই প্রাচীন মনীষীগণ এতদ্দেশের প্রায় প্রত্যেক আচারের সঙ্গেই ধর্ম্মভাব জড়িত করিয়া গিয়াছেন ; অথবা, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ব্যাপারেও যাহাতে ভগবৎ-স্মৃতিমূলক ধর্ম্মভাব চিত্তে উদ্দীপিত হইতে পারে, তজ্জন্যই হয়তো মনীষীগণ প্রত্যেক আচারের সঙ্গে ধর্ম্মকে জড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

ভগবৎ-স্মৃতিমূলক ধর্ম্মভাবের সহিত জড়িত থাকুক বা না থাকুক, প্রত্যেক জাতির বা সমাজের বা সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট আচারকেও এক অর্থে ধর্ম্ম বলা যায়। যদ্দ্বারা ধৃত হয়, তাহাই ধর্ম্ম ; এই সমস্ত বিশিষ্ট আচার দ্বারাই সম্প্রদায়স্থ লোকগণ স্বস্ব সম্প্রদায়ে ধৃত হইয়া থাকে ; তাই তাহারা ধর্ম্ম। দু'একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। যখন সতীদাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন পতির সঙ্গে চিতায় আরোহণ না করিলে উচ্চবর্ণের বিধবাগণ সমাজে এবং গৃহে নিন্দনীয় হইত—তাহারা অসতী বলিয়া পরিগণিত হইত ; কারণ, তাহারা সতীদাহরূপ ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইত। সতীদাহ-প্রথাই তাহাদিগকে স্বীয় গৃহে বা সমাজে শ্রদ্ধার আসনে ধৃত করিয়া রাখিত ; সুতরাং তাহা তাহাদের ধর্ম্ম ছিল। বর্ত্তমান সময়ে অহিন্দুর অন্নগ্রহণ হিন্দুর জাতি-চ্যুতির একটি কারণ ; অহিন্দুর অন্নত্যাগ হিন্দুর একটী আচার—এই আচার হিন্দুকে স্বীয় সমাজে ধৃত করিয়া রাখে, এই আচারের লঙ্ঘন করিলে (অহিন্দুর অন্ন গ্রহণ করিলে) হিন্দু আর হিন্দু-সমাজে থাকিতে পারে না। তাই অহিন্দুর অন্নত্যাগ হিন্দুর একটী ধর্ম্ম—অন্ততঃ অহিন্দুর অন্নগ্রহণ হিন্দুর পক্ষে অধর্ম্ম। কিন্তু এই সমস্ত আচার সমাজ-বিধি মাত্র—তথাপি, তাহারা ধর্ম্ম—অবশ্য অনাত্মধর্ম্ম, কিন্তু আত্মধর্ম্ম নহে।

অনাত্মধর্ম্মের অঙ্গীভূত যে সমস্ত আচার—দেশাচার, লোকাচার, স্ত্রী-আচার (বিবাহাদিতে), সামাজিক আচার প্রভৃতি—তাহাদের স্বরূপ এক এক দেশে, এক এক সমাজে, এক এক জাতিতে এক এক রকম। সুতরাং এই সমস্ত আচার সার্ব্বজনীন নহে,—সম্ভবতঃ সার্ব্বজনীন হইতেও পারে না।

এখন আত্মধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করা যাউক। আত্মধর্ম্মের দুইটী অঙ্গ—সাধ্য ও সাধন—লক্ষ্য ও উপায়।

জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে যে একটা সম্বন্ধ আছে, তাহা সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন ; অবশ্য এই সম্বন্ধের স্বরূপ-সম্বন্ধে মতভেদ আছে ; কেহ বলেন জীব ও ব্রহ্মে অভেদ ; কেহ বলেন জীব ও ব্রহ্মে ভেদ আছে—ব্রহ্ম সেব্য, আর জীব তাঁর সেবক ; ইত্যাদি। সম্বন্ধের স্বরূপ-সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, যে সম্প্রদায় যে স্বরূপ স্বীকার করেন, সে সম্প্রদায় মনে করেন, জীবমাত্রের সঙ্গেই ব্রহ্মের সেই সম্বন্ধ—বিশেষ শ্রেণীর জীবের সহিত ব্রহ্মের কোনও বিশেষ সম্বন্ধ নাই, সকলের সহিত একই সম্বন্ধ ; সুতরাং জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধটী সার্ব্বজনীন, সার্ব্বভৌমিক। কিন্তু

এই সম্বন্ধের অনুভূতি মায়াবদ্ধ জীবের নাই। এই সম্বন্ধের অনুভূতি জাগাইয়া সম্বন্ধানুরূপ অবস্থায় নিজেকে স্থাপন করাই—যেমন, যাঁহারা জীব-ব্রহ্মের অভেদবাদী, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মের সহিত অভেদত্ব প্রাপ্ত হওয়া, মিশিয়া যাওয়া; যাঁহারা সেব্য-সেবকত্ববাদী, তাঁহাদের পক্ষে, সিদ্ধদেহে ব্রহ্মের অভীষ্ট স্বরূপের সেবা পাওয়া; ইত্যাদিই—হইল জীবের লক্ষ্য, ইহাই সাধ্যধর্ম্ম। ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ সার্ব্বজনীন বলিয়া সেই সম্বন্ধানুরূপ সাধ্যধর্ম্মও সার্ব্বজনীন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ সাধ্যধর্ম্মকেও সর্ব্বাংশে সার্ব্বজনীন বলা যায় না। সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই মোটামুটী লক্ষ্য—ব্রহ্মের সহিত জীবের একটা সম্বন্ধ স্থাপন করা; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লক্ষ্য মধ্যে ইহাই সাধারণ; সুতরাং এইটুকুই সার্ব্বজনীন হইতে পারে; কিন্তু সম্প্রদায়ভেদে এই সম্বন্ধের অনেক ইতর-বিশেষ আছে, অনেক বৈচিত্রী আছে; এসমস্ত বৈচিত্রী সর্ব্ববাদিসম্মত নহে; সুতরাং ইহাদিগকে সার্ব্বজনীন বলা যায় না; অবশ্য এ বিষয়ে রুচির পার্থক্যে যদি কোনওরূপ গুরুত্ব আরোপ না করা যায়, তাহা হইলে এ সমস্ত বৈচিত্রীর যে কোনওটীই বোধ হয় সার্ব্বজনীন হইতে পারে; কারণ, এই বৈচিত্রী-স্বীকারে কোনও রূপ শারীরিক আয়াস নাই, সামাজিক প্রতিবন্ধক নাই—ইহা একটী মানসিক ব্যাপার মাত্র।

যাহা হউক, লোকসমাজে সাধ্যধর্ম্মের বৈচিত্রীর সার্ব্বজনীনত্বের উপরে সাধারণতঃ ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনত্ব প্রতিষ্ঠিত নহে—সাধনাঙ্গ এবং আচার দ্বারাই লোক সাধারণতঃ সার্ব্বজনীনত্বের বিচার করিয়া থাকে।

সাধ্যবস্তু-প্রাপ্তির উপায়কেই সাধন বলে—ইহা ইন্দ্রিয়-সাধ্য-ব্যাপার-বিশেষ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে আপাতঃদৃষ্টিতে বিভিন্ন সাধনপন্থা লক্ষিত হইলেও, সকলের মধ্যে এবং সমস্ত সাধনাঙ্গে একটা সাধারণ জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা হইতেছে—ভগবৎ-স্মৃতি বা ব্রহ্মস্মৃতি। বৈচিত্রীভেদে এই স্মৃতিকে কেহ বা ধ্যান বলেন, কেহবা লীলাস্মরণ বলেন; এই স্মরণ,—উপাস্য স্বরূপে এই মনঃসন্নিবেশ,—ইহাই হইল সাধনের প্রাণ; তাই শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—"সাধন স্মরণ-লীলা।" সাধন-বিষয়ে যতকিছু বিধিনিষেধ আছে, সমস্তের মূলেই ভগবৎস্মৃতি; ভগবৎস্মৃতিই মূল বিধি। ভগবৎ-বিস্মৃতিই মূল নিষেধ।

"সততং স্মর্ত্তব্যো বিষ্ণু র্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ ভ, র, সি, ১।২।৫॥"

সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান যদি ভগবৎ-স্মৃতিযুক্ত হয়, তবেই তাহা ফলপ্রদ। কিন্তু তাহা যদি ভগবৎ-স্মৃতিহীন হয়, অনাসঙ্গ হয়—তাহা হইলে কোটিজন্মের অনুষ্ঠানেও সাধ্যবস্তু পাওয়া যাইবে না। তাই শ্রীল রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—"সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি। ভ, র, সি ১।১।২২॥" এবং একথারই প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন, "বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥ ১।৮।১৫॥"

যাহা হউক, সাধনের প্রাণস্বরূপ এই যে সর্ব্ববাদিসম্মত ভগবৎস্মৃতি, ইহা মানসেন্দ্রিয়ের ব্যাপার; ইহাতে শারীরিক ক্লেশ নাই, সামাজিক প্রতিবন্ধক নাই, লৌকিক অসুবিধাও নাই; সুতরাং ইহা সার্ব্বজনীন হইতে পারে; ইহাতেও মনকে স্মরণের উপযোগী করিয়া লইতে হয়—তাহার উপায়ও ঐ স্মরণই; অন্য উপায়ের প্রয়োজন নাই। অবশ্য প্রথমতঃ একটু বেগ পাইতে হইবে; মন ছুটিয়া বিষয়ান্তরে চলিয়া যাইবে—তাহাকে পুনঃ পুনঃ টানিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু একটু চেষ্টা ছাড়া কোন্ বস্তুই বা পাওয়া যায়? প্রকৃতিদত্ত রৌদ্র-বায়ুর জন্যও একটু আয়াস স্বীকার করিতে হয়।

অন্য যত কিছু সাধনাঙ্গ উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্তই ঐ ভগবৎ-স্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ভগবৎ-স্মৃতির সহায়ক। দেশকাল-পাত্রভেদে এ সকল সাধনাঙ্গের বিভিন্নতাও দৃষ্ট হয়। এ সকল সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে জীবমাত্রেরই স্বরূপতঃ অধিকার থাকিলেও সকল অঙ্গের অনুষ্ঠানে সকলের হয়তো সামর্থ্য থাকে না। ব্রহ্মের সঙ্গে সকল জীবেরই সমান সম্বন্ধ বলিয়া ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানে সকলেরই সমান স্বরূপানুবন্ধী অধিকার আছে এবং এই স্বরূপানুবন্ধী অধিকারের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে সকল সম্প্রদায়ের সকল সাধনাঙ্গই হয়তো সার্ব্বজনীন হইতে পারে; কিন্তু যাহা সামর্থ্যের দিক্ দিয়া সার্ব্বজনীন নয়, যে অঙ্গের অনুষ্ঠানে অল্পায়াসে সকলে সমর্থ নহে, লোক-সমাজে তাহা সার্ব্বজনীন বলিয়া গৃহীত হইবে কিনা সন্দেহ। কোনও কোনও সাধনপন্থায় অর্চ্চনা বা বিগ্রহ সেবা সাধনের একটা অঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই অঙ্গটী সার্ব্বজনীন হইতে পারেনা; কারণ, ইহাতে কাহারও কাহারও পক্ষে

স্মৃতিশাস্ত্রের প্রতিবন্ধক আছে, কাহারও কাহারও পক্ষে অন্যরূপ প্রতিবন্ধক বা অসুবিধা আছে। যে কোনও সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে নিজের ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য বস্তুর প্রয়োজন হয়, সেই অঙ্গের সাধনই অনেকের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়—বিশেষতঃ যদি প্রয়োজনীয় অন্য বস্তু অনায়াসলভ্য না হয়।

অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েই—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলের মধ্যেই—প্রার্থনার প্রচলন আছে, নাম-জপের প্রচলন আছে। প্রার্থনায় ও নামজপে অন্য উপকরণ-সংগ্রহের প্রয়োজন নাই, সামাজিক বা লৌকিক প্রতিবন্ধক বা অসুবিধাও নাই; সুতরাং প্রার্থনা, নামজপ ও তদনুরূপ ভজনাঙ্গগুলি সার্ব্বজনীন হইতে পারে—যদি সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী দূর করা যায়।

প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েরই সাধনাঙ্গ-নির্দ্দেশক শাস্ত্র আছে; এসকল শাস্ত্রে সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান-বিষয়ে উপদেশ আছে, সাধনের অনুকূল বিষয়ের উপদেশও আছে। আবার এমন বিধি-নিষেধও আছে, যাহার সহিত সাধনাঙ্গের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই—এইগুলি সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক বিধি। সাধনাঙ্গের সহিত এই সমস্ত বিধির বিশেষ কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও, সাম্প্রদায়িক বিশিষ্টতা রক্ষার জন্য এইগুলি পালিত হইয়া থাকে। এই সকল শাস্ত্রবিহিত আচার ব্যতীতও অনেক আচার প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েই প্রচলিত আছে—প্রায় প্রত্যেককেই এ সমস্ত আচার পালন করিতে হয়—যে কেহ এই আচারের লঙ্ঘন করিবে, সম্প্রদায়ের শাসনদণ্ড তাহার মস্তকে উত্তোলিত হইতে পারে—অনেক স্থলে হইয়াও থাকে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক।

নববিধা-ভক্তির বা তাহাদের কোনও একটীর আধিক্যে অনুষ্ঠানই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মুখ্যভজন। ইহাদের অনুকূল বা অপ্রতিকূল আরও কয়েকটী আচারের আদেশ করিয়া এবং উক্ত নববিধা-ভক্তিরই কোনও কোনওটীর অঙ্গগুলির পৃথক উল্লেখ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু চৌষট্টি-অঙ্গ সাধন-ভক্তির উপদেশ দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আবার বিশটী অঙ্গ সাধনভক্তির দ্বারস্বরূপ; এই বিশটীর মধ্যে আবার দশটী বর্জ্জনাত্মক এবং দশটী গ্রহণাত্মক। বর্জ্জনাত্মক আচারগুলির মধ্যে একটী আছে—সেবাপরাধ, সেবাপরাধ বর্জ্জন করিতে হইবে। সেবাপরাধ সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থের বিভিন্ন তালিকা; শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে আগম, বরাহপুরাণ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বিভিন্ন রকমের তালিকা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সমস্ত তালিকার মিল যে না আছে, তাহা নহে; তবে তাহা খুব কম; অমিলের ভাগই যেন বেশী। তবে বিভিন্ন তালিকাগুলি পাঠ করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভগবদর্চ্চনে শ্রদ্ধাভক্তির বা আগ্রহের অভাব যাহাতে প্রকাশ পায়, তাহাই সেবাপরাধ। যাহাহউক, বিভিন্ন তালিকার মধ্যে একটী তালিকায় দেখা যায়—গণেশের পূজা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে অপরাধ হয় (হরিভক্তিবিলাস ৮।২১৫); কিন্তু তথাপি, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যে গণেশের পূজার প্রথা প্রচলিত নাই, ইহা সকলেই জানেন। এই গণেশের পূজার অভাব কোনও শাস্ত্রের মতে অপরাধজনক হইলেও বর্ত্তমান বৈষ্ণব-সমাজ ইহাকে অপরাধ বলিয়া মনে করেন না। কেবল ইহা নহে, এই তালিকার সাড়ে পনর আনা অংশের অপালনকেও বর্ত্তমান বৈষ্ণব-সমাজ অপরাধজনক মনে করে বলিয়া কার্য্যতঃ দেখা যায় না; কিন্তু এই তালিকার মধ্যে আবার ইহাও আছে যে—"অবৈষ্ণবের পাচিত অন্ন দ্বারা ভোগ দিলে অপরাধ হয়। ৮।২১৫।" গণেশের পূজার অভাবকে এবং এই তালিকার সাড়ে পনর আনা অংশের অপালনকেও অপরাধজনক বলিয়া মনে না করিলেও অবৈষ্ণবের পাচিত অন্ন দ্বারা ভোগ না দেওয়া সম্বন্ধে বৈষ্ণবসমাজ বিশেষভাবে সতর্ক—বরং কিছু অতিরিক্ত সতর্কই বলা যায়। এ বিষয়ে বৈষ্ণবের সংজ্ঞাটীকেও যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—যাঁর মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তিনি বৈষ্ণব; যাঁর মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম বিরাজিত, তিনি বৈষ্ণবতর এবং যাঁহাকে দর্শন করিলেই আপনা-আপনি মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হয়, তিনি বৈষ্ণবতম। আর শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে, "যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং বিষ্ণুসেবাপরায়ণ, তিনি বৈষ্ণব; ভীষণ বিপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াও, অথবা বিপুল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াও যিনি একাদশী ত্যাগ না করেন, যিনি বৈষ্ণব-বিধানে দীক্ষিত, যিনি সর্ব্বভূতে সমচিত্ত, যিনি স্বাচারবান্ এবং যিনি শ্রীহরিতে সমস্ত অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলা যায়; দীক্ষাবিধি, ন্যাস, যন্ত্রসহ দ্বাদশার্ণ বা অষ্টার্ণ মন্ত্রের আরাধনা করিলে এবং হরিপূজায় নিরত থাকিলে সেই ব্যক্তিই সংসারে বৈষ্ণব নামে প্রথিত

১২।১৩২—১৩৪॥" শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বৈষ্ণবের যে সংজ্ঞা বলিয়াছেন, পাচিত-অন্নবিচারে সেই সংজ্ঞা বর্ত্তমান-বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষ আদৃত নহে। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে যে যে লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে, শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর টীকানুসারে তাহাদের সমস্ত লক্ষণ যাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান, তিনিই বৈষ্ণব (তথেতি সমুচ্চয়ে)। কিন্তু যিনি কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করেন, মালাতিলক ধারণ করেন এবং এরূপ আরও দু'একটী আচার পালন করেন—শাস্ত্রবিহিত লক্ষণাক্রান্ত গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া থাকিলেও এবং শাস্ত্রবিহিত মুখ্য ভজনাঙ্গের একটীর অনুষ্ঠান না করিলেও—অধিকন্তু মিথ্যাভাষণ-চৌর্য্যাদি দোষে দুষ্ট হইলেও অন্নপাকের অধিকারি-বিচারে বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহারই সমাদর করিয়া থাকেন ; যিনি সম্প্রদায়-প্রচলিত নিয়মে দীক্ষিত নহেন, এবং যিনি তিলকাদি ধারণ করেন না, তাঁহার "গৌরাঙ্গ বলিতে পুলক শরীর" হইলেও এবং "হরি হরি বলিতে তাঁহার নয়নে নীর" প্রবাহিত হইলেও রান্নাঘরের ছায়া-স্পর্শের অধিকারও যেন কোনও কোনও বৈষ্ণব তাঁহাকে দিতে চাহেন না।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত অপরাধ-তালিকায় কেবল পাচিত **অন্ন** সম্বন্ধেই বৈষ্ণবত্বের বিচারের কথা আছে ; ফল, মূল প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য রন্ধন ব্যতীতই ভোগে দেওয়া যায়, সে সকলের ভোগের উপযোগী ভাবে প্রস্তুতীকরণ সম্বন্ধে কোনও কথা তাহাতে নাই এবং জল সম্বন্ধেও কোনও কথা নাই। কিন্তু বর্ত্তমান বৈষ্ণব-সমাজের মতে যিনি বৈষ্ণব নহেন, ফল-মূল তৈয়ার করার কথা তো দূরে—জল স্পর্শের অধিকার, এমন কি স্থলবিশেষে রান্নার কি ভোগের ঘর স্পর্শ করিবার অধিকারও বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাকে দেন না—বৈষ্ণব-সমাজে তিনি অস্পৃশ্য ;—যদিও এরূপ অস্পৃশ্যতা শাস্ত্র এবং প্রাচীন মহাজনগণের আচরণের অনুমোদিত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না।* কেহ কেহ বলেন—"তৃণাদপি সুনীচেন এবং অমানিনা মানদেন" নীতির উপাসক বৈষ্ণব-সমাজের এইরূপ ব্যবহারে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সমুদার ধর্ম্মে সঙ্কীর্ণতা এবং তাঁহার মরমের ধর্ম্মে কপটতা প্রবেশ করিয়াছে। এই উক্তির মূল্য কতটুকু, তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন। কিন্তু এতাদৃশ আচারের ফলে অনেক বৈষ্ণবের যে বিশেষ অসুবিধা এবং বিশেষ কষ্ট হইতেছে—তাহা অন্ততঃ মনে মনে সকলেই স্বীকার করিবেন। অনেকে এইরূপ আচারের পালনকেই যেন জীবনের ব্রত করিয়া বসিয়াছেন—ইহার প্রাবল্যে মুখ্য ভজনাঙ্গকে অনেক সময়ে দূরে সরিয়া থাকিতে হইতেছে। আমাদের মনে হয়, ইহা বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের জাতির বিশেষত্ব-সূচক আচারেরই বিস্তৃতি মাত্র। ইহাও বৈষ্ণবদিগের একটী

---

* বৃন্দাবন-গমনের পূর্ব্বে শ্রীনিবাস যখন ঠাকুর শ্রীঅভিরামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীঅভিরাম তাঁহাকে পরীক্ষা করার জন্য আটকড়া কড়ি দিলেন। শ্রীনিবাস তদ্দ্বারা তণ্ডুলাদি কিনিয়া এক কদলী-বনে রন্ধনাদি করিলেন। এদিকে অভিরাম তাঁহার নিকট দুইজন বৈষ্ণব পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীনিবাস যখন তাঁহার পাচিত অন্ন শ্রীরাধাকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া আচমন দিলেন, তখনই সেই দুই বৈষ্ণব সেই স্থানে উপনীত হইয়া প্রসাদ চাহিলেন—তাঁহারা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত বলিয়াও প্রকাশ করিলেন। ভোগের অন্ন তিনজনে বণ্টন করিয়া খাইলেন (প্রেমবিলাস, ৫ম বিলাস, ৫১ পৃঃ)। শ্রীনিবাসের তখনও দীক্ষা হয় নাই ; শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার পরে তাঁহার দীক্ষা হইয়াছিল ; কিন্তু উক্ত ঘটনার সময় দীক্ষা না হইয়া থাকিলেও শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সংজ্ঞা অনুসারে তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। তখনও তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ-নিবেদন করিয়াছেন এবং তাঁহার পাচিত ও নিবেদিত অন্ন বৈষ্ণবদ্বয় গ্রহণও করিয়াছেন।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু গয়াতে বিষ্ণুপদে পিণ্ডদানের পরে একদিন রন্ধন করিয়া সব প্রস্তুত করিয়াছেন, এমন সময় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী সেস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুর পাচিত অন্ন ঈশ্বরপুরী আহার করিলেন। তখনও লৌকিক লীলায় প্রভুর দীক্ষা হয় নাই।

বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসার পথে প্রভু যখন কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন মহারাষ্ট্রীয় এক ব্রাহ্মণ একদিন প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও তাঁহার দশহাজার শিষ্যকে ভোজন করাইয়াছিলেন—নিজ গৃহে। প্রভুও তাঁহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। দশহাজারেরও বেশী লোকের আহার্য্য প্রস্তুত করা দু'চার জন লোকের সাধ্যাতীত। অথচ তখন তপনমিশ্রাদি দু'তিনজন লোক-ব্যতীত প্রভুর অনুগত বৈষ্ণব কাশীতে কেহ ছিলেন না ; কাশীতে তখন অন্য বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়াও জানা যায় না। এত লোকের জন্য রন্ধন করিলেন কাহারা ? যাঁহারাই করিয়া থাকেন, প্রভুও তাঁহাদের পাচিত অন্ন (ভাত, বা লুচি তরকারী আদি) গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রাচীনগ্রন্থে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। কেহ কেহ এসমস্ত আচরণের সঙ্গে বৈষ্ণব-সমাজের বর্ত্তমান আচরণের তুলনা করিয়া থাকেন। এসমস্ত আচরণ অনুকরণীয় কিনা, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন।

সামাজিক আচার মাত্র। তথাপি বর্ত্তমান-বৈষ্ণব-সমাজে ইহা সাধনাঙ্গের ন্যায়ই পালনীয়—সম্ভবতঃ সাধনাঙ্গ হইতেও ইহার স্থান উর্দ্ধে। ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান কেহ করিতেছেন কিনা, প্রায়ই কেহ তাহার অনুসন্ধান লয় না—এমন কি প্রায়শঃ গুরুদেবও সে খোঁজ লন না; কিন্তু বৈষ্ণব-সমাজের সামাজিক আচারের কেহ লঙ্ঘন করিলে সমাজ তাহাকে ক্ষমা করিবে কিনা সন্দেহ।

কেবল বৈষ্ণব-সমাজে কেন, সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েই এইরূপ কতকগুলি সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক আচার আছে, যাহা সকলেরই পালন করিতে হয়। এইরূপ আচারগুলিও সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। বস্তুতঃ, যাহা সর্ব্বসাধারণ অনায়াসে পালন করিতে পারে না, তাহা কখনও সার্ব্বজনীন হইতে পারে না।

আরও একটী গুরুতর বিষয়ে বিবেচনা দরকার; তাহা এই। প্রায় সর্ব্বত্রই আত্মধর্ম্ম সমাজের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, আক্ষরিক বিচারে আত্মধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকৃত হইলেও কার্য্যতঃ আত্মধর্ম্মের উপরে সমাজেরই প্রাধান্য সর্ব্বত্র বিরাজিত; আত্মধর্ম্ম সমাজধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে, সমাজ-ধর্ম্ম যেন আত্মধর্ম্মকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। আত্মধর্ম্মের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানে স্বরূপতঃ সকলের অধিকার থাকিলেও কার্য্যতঃ কিন্তু এক এক সমাজের জন্য এক একটী ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে—এক সমাজের লোক অন্য সমাজের আত্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে না; হিন্দুসমাজে থাকিয়া কেহ মহম্মদের বা যীশুখৃষ্টের উপদিষ্ট মুখ্য সাধনাঙ্গেরও অনুষ্ঠান করিতে পারে না; মুসলমান বা খৃষ্টান-সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ হিন্দু-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও হিন্দু সমাজ তাহাকে গ্রহণ করিবে না। বস্তুতঃ সামাজিক আচার গ্রহণ না করিলে আত্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও কেহ সমাজে স্থান পাইতে পারে না—সাধারণ লোক আত্মধর্ম্ম অপেক্ষা সমাজের জন্যই বেশী ব্যস্ত—কারণ, সমাজকে উপেক্ষা করিয়া কেহ সংসারে চলিতে পারে না। অথচ কোনও সমাজের বিশিষ্ট আচারই সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। এইরূপে সমাজের সহিত জড়িত হওয়ায় এবং সামাজিক আচারগুলিও অধিকাংশ-স্থলে আত্মধর্ম্মের অঙ্গীভূতরূপে গৃহীত হওয়ায়, কোনও ধর্ম্মই সার্ব্বজনীন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই বুঝা গেল যে, কোনও অনাত্মধর্ম্ম সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। আত্মধর্ম্মের সাধ্যাংশেও বিভিন্ন মতানুসারে বিভিন্ন বৈচিত্রী আছে বলিয়া তাহাও সার্ব্বজনীন হইতে পারে না; তবে বিভিন্ন বৈচিত্রীর মধ্যেও এইটুকু মাত্র সাধারণ যে, সকল সম্প্রদায়ই ব্রহ্মের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চেষ্টা করে। সম্বন্ধেরও আবার বিভিন্ন বৈচিত্রী আছে; এই সকল বিভিন্ন বৈচিত্রীর প্রত্যেকটীতেই স্বরূপানুবন্ধী অধিকার হিসাবে প্রত্যেক জীবেরই অধিকার থাকিলেও বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি বলিয়া কোনও বৈচিত্রীই সার্ব্বজনীন ভাবে গৃহীত হইতে পারে না। সাধন-ধর্ম্মেরও আবার বহু বৈচিত্রী, সমস্ত সাধনাঙ্গের মূল ভিত্তি—ভগবৎস্মৃতি; ইহা সার্ব্বজনীন বটে; কিন্তু সাধ্যধর্ম্মের বৈচিত্রী-অনুসারে স্মৃতিরও বৈচিত্রী আছে বলিয়া কার্য্যতঃ ভগবৎস্মৃতির কোনও একটী প্রকারও লোকের রুচিভেদবশতঃ সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। নামকীর্ত্তন, প্রার্থনাদি সার্ব্বজনীন হইতে পারে; কিন্তু সাম্প্রদায়িতার প্রভাব সেস্থলেও বিঘ্ন জন্মাইতে পারে; বিভিন্ন সম্প্রদায়ে নাম-কীর্ত্তনাদির বিভিন্ন রীতি। যে সমস্ত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে বাহিরের উপকরণাদির প্রয়োজন, সে সমস্ত সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। আবার যাহা স্বরূপতঃ সাধনাঙ্গ নহে, বস্তুতঃ সামাজিক আচার, অথচ যাহা সাধনাঙ্গের ন্যায়ই সম্মানিত, তাহাও কখন সার্ব্বজনীন হইতে পারে না; তাহা বরং প্রায়শঃই ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের, এবং ধর্ম্মানুরাগের নামে ধর্ম্মান্ধতারই প্রশ্রয় দান করিয়া লোক-সমাজে বিষম অনর্থের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ফলতঃ কোনও ধর্ম্মই ব্যবহারিকভাবে সার্ব্বজনীন হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। প্রামাণ্য শাস্ত্রে যে সকল ধর্ম্মকে সার্ব্বজনীন বলা হইয়াছে, আমাদের মনে হয়—জীবের স্বরূপানুবন্ধী অধিকারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাহা বলা হইয়াছে—জীবের সামর্থ্য বা ঐ সকল ধর্ম্মের সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান-যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলা হয় নাই।